বাংলাদেশে রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা*

- মোঃ আনিসুর রহমান

১৯৯৭ সালের রবীন্দ্রজয়ন্তীর সময় আমি বাংলাদেশের কয়েকজন প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীর সঙ্গে কলকাতায় রবীন্দ্রসদনে গান করতে যাই। আমাদের দলে দেশের পুরোভাগের রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন রিজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, মিতা হক, সাদী মোহাম্মদ, এবং ইফফাত আরা দেওয়ান। আমি সবচাইতে বয়স্ক ছিলাম বলেই বোধ হয় প্রথমেই আমাকে বাংলাদেশ টীমের সবার হয়ে কিছু বলতে অনুরোধ করা হয়। আমি আমার বক্তৃতা এই বলে শুরু করি যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছিল কয়েকটা স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি বা আশা নিয়ে যাদের কোনটাই পূরণ হয় নি শুধুমাত্র একটি ছাড়া - সেই একটি হল আমাদের রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার অধিকার আদায় করা। স্বাধীনতার আগে আমাদের রবীন্দ্রসঙ্গীতের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দেবার অপচেষ্টা হয়েছিল, এবং স্বাধীনতার পর এ দেশে রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চার রীতিমতো জোয়ার এসে গিয়েছে। এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা। অন্যান্য মহলের মধ্যে ছায়ানট সঙ্গীত গোষ্ঠী ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, যেখানে সর্বজনশ্রদ্ধেয়া বেগম সুফিয়া কামাল, সিধু ভাই মোখলেসুর রহমান, তাঁর স্ত্রী রোজ বু, হোসনে আরা (মাক্কী বু), কলিম শরাফী, ওয়াহিদুল হক, সনজিদা খাতুন ও জাহেদুর রহিমের মতো রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রেমিক ও শিল্পী সবাই ছিলেন যাঁদের দেশে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে প্রতিষ্ঠা করবার আন্দোলনে অসামান্য অবদান এদেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এই জোয়ারের ফসল হিসাবে দেশে ক্রমে আরো অসংখ্য রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা ও শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং বর্তমানে দেশে প্রতি বছর হাজার হাজার তরুন-তরুণী রবীন্দ্রসঙ্গীতে শিক্ষা নিচ্ছে। স্বাধীনতার আগে থেকে শুরু করে এবং স্বাধীনতার পরে সম্পূর্ণ এদেশের মাটিতে তৈরি যে কয়েকজন উদীয়মান রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন তাঁদের মধ্যে জাহেদুর রহিম, ফাহমিদা খাতুন, সেলিনা মালেক, মহিউজ্জামান ময়না, ইকবাল আহমদ, ইফফাত আরা দেওয়ান, লাইসা আহমদ লিসা এবং মিতা হকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য (শান্তিনিকেতন থেকে যাঁরা শিখে এসেছেন তাঁদের কথা উল্লেখ করছি না)। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে যেন এই মাটিতে এরকম মানের রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পী সৃষ্টিতে ভাঁটা পড়েছে। দেশে এতগুলি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, কিন্তু এদের শিক্ষা থেকে এদেশে সাম্প্রতিক কালে শ্রোতাদের বিহ্বল করে দেবার মতো কয়জন রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পী সৃষ্টি হয়েছে এই প্রশ্নের উত্তর বোধ হয় খুব একটা উৎসাহব্যাঞ্জক হবে না। অথচ আমাদের ছেলেমেয়েরা কোন দেশেরই ছেলেমেয়েদের চাইতে সঙ্গীতে কম সম্ভাবনাময় একথা তো স্বীকার করা যায় না। তাহলে সমস্যাটা কোথায়? এই প্রশ্নের আলোচনাই আমার আজকের উদ্দেশ্য।

আমার বিচারে আমরা সংখ্যাগত দিক দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চললেও গুণগত দিক দিয়ে প্রথম শ্রেণীর রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সৃষ্টিতে পিছিয়ে পড়ছি চারটি প্রধান কারণে। এক, রবীন্দ্রসঙ্গীতের কাব্য-রসের অবহেলা। দুই, রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী সম্বন্ধে ভূল ধারণা নিয়ে এই সঙ্গীতকে প্রকৃত শিল্প হিসাবে না দেখা; তিন, রবীন্দ্রসঙ্গীতে যথার্থ শিক্ষকের অভাব; চারঃ মিডিয়াতে যোগ্য সঙ্গীত-সমালোচকের অভাব।

এক: রবীন্দ্রসঙ্গীতের কাব্য-রসের অবহেলাঃ

রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিবেশনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজেরই সম্পূর্ণ আলোচনা রয়েছে তাঁর সঙ্গীত সম্বন্ধে অসংখ্য রচনায়, আলোচনায় ও চিঠিতে। এগুলোর সিংহভাগ একসঙ্গে *সংগীতচিন্তা* বইতে ছাপাও আছে।

এদেশের কোন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কবির সংগীতচিন্তা যত্ন করে কেন, আদৌ আলোচনা হয় বলে আমার জানা নেই। রবীন্দ্রনাথের সংগীত-চিন্তা থেকে কয়েকটি বক্তব্য এখানে পেশ করছি:

রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতকে বরাবরই কণ্ঠমাধুর্য দেখাবার অবলম্বন নয়, ভাবপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায় বলে দেখেছেন। এ বিষয়ে তাঁর অসংখ্য মন্তব্য ও আলোচনার কয়েকটি এই:

"সঙ্গীত কৌশল প্রকাশের স্থান নহে। ভাব প্রকাশের স্থান। যতখানিতে ভাবপ্রকাশের সাহায্য করে ততখানিই সঙ্গীতের অন্তর্গত, যাহা কিছু কৌশল তাহা সঙ্গীত নহে তাহার অন্য নাম।"
"সঙ্গীত সুরের রাগরাগিনী নহে, সঙ্গীত ভাবের রাগরাগিনী।"
"সঙ্গীতের উদ্দেশ্যই ভাব প্রকাশ করা।...কেবলমাত্র সুরসমষ্টি ভাব না থাকিলে জীবনহীন দেহ মাত্র; সে দেহের গঠন সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে জীবন নাই।"
"ভাবশূন্য সুরের একটা আকর্ষণ আছে, তাহা কানে মিষ্ট শুনায়। এই জন্য ভাবের অভাব হইলেও একটা ইন্দ্রিয়সুখ তাহাতে পাওয়া যায়। ...যাহারা গানের সমঝদার এই জন্যই তাহারা অত্যন্ত উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া বলে অমুক লোক মিষ্ট গান করে। ভাবটা এই যে, মিষ্ট গায়ক গানকে আমাদের ইন্দ্রিয়সভায় আনিয়া নিতান্ত সুলভ প্রশংসার দ্বারা অপমানিত করে, মার্জিত রুচি ও শিক্ষিতের দরবারে সে প্রবেশ করেনা।..."
"যে লোক যে বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়াছে সে তাহার গোড়ার দিককার নিতান্ত সহজ ও ললিত অংশকে আর খাতির করে না। কারণ, সেটুকুর সীমা সে জানিয়া লইয়াছে; সেটুকুর দৌড় যে বেশি দুর নহে তাহা সে বোঝে; এই জন্যই তাহার অন্তঃকরণ তাহাতে জাগে না। অশিক্ষিত সেই সহজ অংশটুকুই বুঝিতে পারে; অথচ তখনও সে তাহার সীমা পায় না, এই জন্যই সেই অগভীর অংশেই তাহার একমাত্র আনন্দ। সমঝদারের আনন্দকে সে একটা কিম্ভুত ব্যাপার মনে করে..."
"এখন যেমন সঙ্গীত শুনিলেই সকলে বলেন, 'বাঃ, ইহার সুর কী মধুর', এমন দিন কি আসিবে না যেদিন সকলে বলিবেন, 'বাঃ, কী সুন্দর ভাব'।"
এই উদ্ধৃতিগুলো থেকে একথা অত্যন্ত পরিষ্কার যে রবীন্দ্রনাথ দুই ধরনের গান পরিবেশনার মধ্যে পার্থক্য টেনেছেন: এক ধরনের গান ইন্দ্রিয়সুখ দেয় মাত্র, যা শুধু কানেই মিষ্টি শোনায়, মনের গভীরে প্রবেশ করে না তাতে ভাব নেই বলে। আর এক ধরনের গান ভাবময়, যা অন্ত:করণ স্পর্শ করে। এ ধরনের গানই মার্জিত-রুচি শ্রোতার জন্য। রবীন্দ্রনাথ এ ধরনের গানের জন্যই তৃষ্ণার্ত ছিলেন, সেই দিনের জন্য চেয়েছিলেন যখন গায়ক ও শ্রোতা উভয়েই ভাবে নিবিষ্ট হয়ে যাবে, গায়ক গানের ভিতর দিয়ে ভাবের স্রোত সঞ্চারিত করে শ্রোতার অন্তঃকরণ স্পর্শ করবে।

আর এ সম্বন্ধে কবি তাঁর চূড়ান্ত কথা বলে গেছেন তাঁর বিখ্যাত কবিতায়:

শুধায়োনা, কবে কোন্ গান
কাহারে করিয়াছিনু দান।
পথের ধুলার পরে
পড়ে আছে তারি তরে
যে তাহারে দিতে পারে মান।

তুমি কি শুনছ তার বাণী,
হৃদয়ে দিয়েছ তারে টানি ?
জানি না তোমার নাম,
তোমারেই সঁপিলাম
আমার ধ্যানের ধনখানি ।।

অর্থাৎ, কবি স্পষ্টতই চেয়েছিলেন তাঁর গান দিয়ে তাঁর অসামান্য বাণী প্রকাশ করা হবে, গানের কথাগুলিকে টেনে-হিঁচড়ে শুধু কন্ঠের মাধুর্য ও দক্ষতার প্রদর্শনী হবে না।

২. রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কীর প্রশ্ন

এসমস্তের মধ্যেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কীর প্রশ্নেরও উত্তর নিহিত। অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার বিশেষ একটা ধরন আছে যা সকলের জন্য নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজে এ ধরনের মত কখনোই প্রকাশ করেন নাই। তিনি শুধুমাত্র তাঁর দেওয়া সুর তাল নিয়ে ভাবে মগ্ন হয়ে তাঁর গান গাইতে বলেছেন। এক শিক্ষক (শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবিশ)-কে তিনি লিখেছিলেন, *"তোমার কাছে আমার সানুনয় অনুরোধ, একটু দরদ দিয়ে, রস দিয়ে, গান শিখিয়ো। এইটেই আমার গানের বিশেষত্ব।"* স্পষ্টত: এইটেই, অর্থাৎ গানের কাব্যরস অনুযায়ী দরদ দিয়ে, রস দিয়ে, গাওয়াই রবীন্দ্রনাথের মতে তাঁর গানের গায়কী।

গানের রসে মজে যাওয়া একান্ত ব্যক্তিগত একটি <u>সৃষ্টিশীল</u> ও স্বত:স্ফূর্ত প্রক্রিয়া যা কাউকে <u>অনুকরণ</u> করে গাইলে হয় না। অনুকরণ সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল:

"অবিকল নকল দেখিলেই বুঝা যায় -যে অনুকারণকারী অনুকৃত পদার্থের ভাব আয়ত্ব করিতে পারে নাই।"
"বিশ্বরূপের অন্তরতর এই অপরূপকে প্রকাশ করিবার জন্যই শিল্পীদের গুণীদের এত ব্যাকুলতা। এই জন্য তাঁহাদের সেই চেষ্টা অনুকরণের ভিতর দিয়া কখনোই সফল হইতে পারে না।"
"সচেতনকে যদি বলা যায়, তুমি কেবল এইটুকুর মধ্যে চিরকাল থাকবে তার এক পা বাইরে যাবে না, তাহলে তার চৈতন্যকে অপমান করা হয়।"
"যে মানুষ গান বাঁধিবে আর যে মানুষ গান গাহিবে দু'জনেই যদি সৃষ্টিকর্তা হয় তবে তো রসের গঙ্গাযমুনাসংগম। যে গান গাওয়া হইতেছে সেটা যে কেবল আবৃত্তি নয়, তাহা যে তখন তখনি <u>জীবন উৎস হইতে তাজা উঠিতেছে</u> [নীচের রেখা যোগ করা হয়েছে] , এটা অনুভব করিলে শ্রোতার আনন্দ অক্লান্ত অম্লান হইয়া থাকে।"
"গানের প্রকাশ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অগত্যা মানতেই হবে অর্থাৎ গানের দ্বারা গায়ক নিজের অনুমোদিত বিশেষ ভাবের ব্যাখ্যা করে যে ব্যাখ্যা রচয়িতার অন্তরের সঙ্গে না মিলতেও পারে। গায়ক তো গ্রামোফোন নয়।"
"গানের গতি অনেকখানি তরল, কাজেই তাতে গায়ককে খানিকটা স্বাধীনতা তো দিতেই হবে ...তাই, আদর্শের দিক দিয়েও আমি বলি নে যে, আমি যা ভেবে অমুক সুর দিয়েছি তোমাকে গাইবার সময় সেই ভাবেই ভাবিত হতে হবে। তা যে হতেই পারে না।... তাই একস্‌প্রেশন ভেদ থাকবেই, যাকে তুমি (দিলীপ রায়) বলছ ইনটারপ্রিটেশনের

স্বাধীনতা।...তোমার ঢঙের [অর্থাৎ গায়কীর] সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে তোমার একটা নিজস্ব ঢঙ গড়ে উঠেছে, এটা তো খুবই বাঞ্ছনীয়। তাই তোমার স্বকীয় ঢঙে তুমি 'হে ক্ষণিকের অতিথি' গাইলে যে ভাবে, আমার সুরের গঠনভঙ্গি রেখে একসপ্রেশনের যে স্বাধীনতা তুমি নিলে, তাতে আমি সত্যিই খুশি হয়েছি।"

"তুমি (ঝুনু অর্থাৎ সাহানা দেবীকে) যখন আমার গান করো, শুনলে মনে হয় আমার গান রচনা সার্থক হয়েছে, সে গানে যতখানি আমি আছি ততখানি ঝুনুও আছে - এ মিলনের দ্বারা যে পূর্ণতা ঘটে সেটার জন্য রচয়িতার সাগ্রহ প্রতীক্ষা আছে।"

এই উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের খুব মৌলিক বক্তব্য আছে যা আমার মনে হয় রবীন্দ্র সঙ্গীতের খুব কম শিক্ষকই যথার্থ অনুধাবন করে তাঁদের শিক্ষকতার কাজে রবীন্দ্রনাথের গান রচনা এভাবে সার্থক করার ব্যাপারে সহায়তা করছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান পরিবেশনে কোনরকম অনুকরণ চান নাই, তাঁর নিজেকেও নয়, অপর কোনো প্রতিভাবান গায়ককে তো নয়ই। তিনি তাঁর গানে তাঁর "সুরের গঠনভঙ্গী"(কাঠামো) বজায় রেখে সেই কাঠামোর মধ্যে গায়কের (কণ্ঠশিল্পীর) স্বতঃস্ফুর্ত, "জীবন উৎস হইতে তাজা" উঠে আসা অর্থাৎ জীবন্ত বিহার চেয়েছেন, সচেতনের চৈতন্যকে অপমান করে তিনি কখনোই বলেন নাই যে তোমাকে ঠিক এইভাবেই গাইতে হবে। এই স্বাধীনতা পেলেই কেবল গায়ক গান পরিবেশনে দরদ বা ভাব দিতে পারে। কারণ দরদ বা ভাব অন্তঃকরণের জিনিস, এ জিনিস একান্তই ব্যক্তিগত, তার ওপর গায়কের নিজের ছাড়া আর কারো কোনো অধিকার নেই। একজন চিত্রশিল্পীর আঁকা ছবির মতোই যে কোন কণ্ঠশিল্পী তার গান দিয়ে যে সুরচিত্র আঁকে তা কারো ভালো লাগতে পারে কিম্বা নাও লাগতে পারে, কিন্তু কারোই বলবার অধিকার নেই যে ছবিটি এইভাবেই আঁকতে হবে। রবীন্দ্রনাথের নিজের সঙ্গীতচিন্তায় এই ধরনের অশৈল্পিক, অমার্জিত ধারণা একেবারেই ছিল না।

এদেশে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ঐতিহ্যবাহী একটি মহল যেন এই দাবী করে চলেছে যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশেষ একটি গায়কী আছে যে-ভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত না গাইলে তা রবীন্দ্রসঙ্গীত হয় না। একথা বিশ্বাস না হলেও সত্য-যে উভয় বাংলা মিলিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতে বোধ হয় সবচাইতে জনপ্রিয় শিল্পী বর্তমানে পরলোকগত দেবব্রত বিশ্বাস বাংলাদেশের প্রধান রবীন্দ্রসঙ্গীত 'ধারার" কাছে নিন্দিত' । এই কালজয়ী শিল্পীর "ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সঙ্গীত" পড়ে তার অনেক ভক্ত কেঁদেছেন। শান্তিনিকেতনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়িকা পরলোকগত কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সরাসরি দেবব্রত বিশ্বাসের গান সম্পর্কে যে অভিমত শুনেছি তা রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুরাগীদের জানানো ও তার তাৎপর্য আলোচনা করা প্রয়োজন। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে যখন কণিকা বন্দোপাধ্যায় ঢাকায় আসেন তখন রিজওয়ানা চৌধুরী বন্যার বাসায় নাসরিন শামস্‌ তার কাছে রবীন্দ্র সঙ্গীতের গায়কীর প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং সেই প্রসঙ্গে দেবব্রত বিশ্বাসের গানের কথা ওঠে। সে ঘরে তখন রিজওয়ানা চৌধুরি বন্যা, নাসরিন শামস, ইফফাত আরা দেওয়ান ও আমি উপস্থিত ছিলাম। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় নাসরিন শামসের প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, একবার দেবব্রত বিশ্বাসের কয়েকটি গানের একটি ক্যাসেট বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডে অনুমোদনের জন্য আসলে সেই ক্যাসেটটি বোর্ড reject করে দেয়। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় সে সময় মিউজিক বোর্ডে ছিলেন না। কিন্তু কয়েকজন তার কাছে ওই ক্যাসেটটি শোনাতে নিয়ে আসে গানগুলি সম্বন্ধে তার অভিমত শোনবার জন্য। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় গানগুলি শুনে বলেছিলেন, "আমি জানি না সুর একটু এদিক ওদিক হয়েছে কিনা, কিন্তু এরকম অসাধারণ রস দিয়ে জর্জ দা যে গান গেয়েছেন এ গান কি কেউ reject করতে পারে?

তোমরা ওদের বলে দিও আমার এই কথা" (হাত ও তর্জনী তুলে) । তারপরেও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে যান "জর্জদা"র কথা। "এতো হাজার হাজার লোককে তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনিয়ে মুগ্ধ করেছেন, কি রস তার গানে, এইটাই তো বড়ো কথা, স্বরলিপির সুর তো একটা কাঠামো মাত্র, একটা কঙ্কাল, তাতে রক্ত মাংস দিয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবার দায়িত্ব তো শিল্পীর হাতে।"

বাংলাদেশেও বহু রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুরাগী এই "ব্রাত্যজনের" "রুদ্ধ সঙ্গীত" শুনে অভিভূত। কয়েক বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের এক ছাত্রী আমাকে বলে যে, দেবব্রত বিশ্বাসের "নয়ন ছেড়ে গেলে চলে" গানটি শুনে সে স্তব্ধ হয়ে গেছে, তার শরীরে এক অনির্বচনীয় শিহরণ এসে তাকে কোথায় যেন নিয়ে গেছে। আমি অবাক হয়ে তার কথা শুনে যাই নতুন এই প্রজন্মের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের গভীরতাকে কে পৌঁছে দিচ্ছে?

রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কীর প্রশ্নে শ্রী শান্তিদেব ঘোষও একই কথা বলেছেন:

'বিশুদ্ধ রবীন্দ্র সঙ্গীত' নাম দিয়ে এক বিশেষ ধারার গানের কথা এখন প্রায়ই শোনা যায়। 'বিশুদ্ধ রবীন্দ্র সঙ্গীতে'র প্রচারকরা গুরুদেবের গানে বিশেষ এক ধরনের গায়কীর প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন।...রবীন্দ্র সঙ্গীত নিয়ে এ ধরনের চিন্তার সত্যিই কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। কেননা, গুরুদেবের গানে ভিন্ন প্রকৃতির গায়কীর যদি কিছু থাকতো, এবং তার প্রয়োজন আছে বলে গুরুদেব সত্যিই মনে করতেন, তাহলে নিশ্চয় তা নিয়ে কিছু-না-কিছু লিখে যেতেন...রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইবার অধিকার সকলেরই আছে; সকলেই গাইবার চেষ্টা করবে,...কিন্তু কেবল পোষা পাখীর মত... মুখস্থ করে গেয়ে যাওয়াই মুখ্য হবে না। উদ্দেশ্য হবে নিজে গান গেয়ে রসে মনকে মজিয়ে তোলা। এইভাবে গানের রসে রসিয়ে নেবার সামর্থ থেকেই রসিক শ্রোতারা তা শুনে পাবে তৃপ্তি। এই হলো সব গানেরই শেষ কথা। (*রবীন্দ্র সঙ্গীত বিচিত্রা*, শান্তিদেব ঘোষ, পৃ ১০৯)

একটি ব্যাপার অনেকে লক্ষ্য করে থাকবেন যে একই গায়ক বা গায়িকার অতুলপ্রসাদের গানের পরিবেশন তাঁরই রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনার চাইতে অনেক সময় বেশী প্রাণবন্ত, ভাবরসময় হয়[২]। বলাই বাহুল্য, এর প্রধান কারণ অতুলপ্রসাদের গানের পরিবেশনা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষকতার মাধ্যমে (এবং শিক্ষকতার গতানুগতিক পদ্ধতিতে) ষ্ট্যান্ডারডাইজ্ করবার কোন প্রচেষ্টা হয় নাই, যার ফলে এই পরিবেশনায় স্বত:স্ফুর্ততার স্বাভাবিক প্রকাশ নিরুৎসাহিত হয় নাই।

খুব উঁচু দরের সঙ্গীতশিল্পীও রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে কিরকম নিরুৎসাহ হতে পারেন তার প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ আমি পেয়েছিলাম (পরলোকগত) নীলুফার ইয়াসমীনের সঙ্গে কথা বলে। নীলুফার ইয়াসমীনের অসাধারণ গান পরিবেশনা সুবিদিত, এবং তিনি নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, পুরানো দিনের বাংলা গান, কীর্তন ইত্যাদি বহুবিধ গান পরিবেশনায় সমান পারদর্শী ছিলেন। আমি একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করি আমাদের রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে কী অপরাধ করেছেন যে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত একেবারে স্পর্শ করেন না। নীলুফার উত্তর দেন, *"ভাই আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত ভীষণ পছন্দ করি, এবং গীতবিতান বিছানায় নিয়ে শুতে যাই, কিন্তু গাইতে সাহস হয় না যদি স্টাইলটা ঠিকমতো না হয়!"*। নীলুফার ইয়াসমীনের মতো এরকম দক্ষ এবং ভাবরসময় কণ্ঠশিল্পী যিনি এতো রকমের গান এত অবলীলাক্রমে এমন অর্থ বুঝে এত সুন্দর করে পরিবেশন করে গেছেন তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত হবে না এরকম ভয় দেয়া হয়েছিল তাঁর মনে?

যে কোন 'আর্ট-সঙ্গীতের' মতো রবীন্দ্রসঙ্গীতেরও উদ্দেশ্য বিশেষ গানের বিশেষ কাব্যরসটি 'আপন মনের মাধুরী দিয়ে' ফোটানো, সঙ্গীত শিল্পী নিজে যেভাবে কাব্যরসটি ইন্টারপ্রিট করেন সেই ইন্টারপ্রিটেশন অনুযায়ী। রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনায়, এই সঙ্গীতের গায়কীর আলোচনায়, কবির কাছ থেকে এই রূপসৃষ্টির স্পষ্ট আহ্বান এদেশে যেন অবহেলিত হয়ে রয়েছে, যেন স্বরলিপি-নির্দেশিত সুরের গন্ডি অতিক্রম না করার অনুশাসনটিই শিক্ষক ও গায়কদের বেশি ব্যস্ত রেখেছে। গন্ডিটি দেখানো প্রয়োজন, কারণ এ রবীন্দ্রসঙ্গীত, আর কোনো সঙ্গীত নয়, কিন্তু এর স্পিরিটটি ইতিবাচক হওয়া প্রয়োজন, অর্থাৎ এটি অনুশাসনের ভাষা না হয়ে আমন্ত্রনের ভাষা হওয়া প্রয়োজন, অর্থাৎ *'তুমি এসো আমার আঙিনায়, তোমার জন্য এঁকে দিয়েছি আমার সুরের আলপনা, তার ওপরে নেচে তোমার সৃষ্টিশীলতা দেখাও, তোমার শিল্পসত্তা চরিতার্থ করো'*। বাণী ও সুর হলো গানের দুটি ডাইমেনশন্
যেগুলি কবির দেয়া; এই বাণী নিয়ে এই সুরের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া সংগীত-ঢেউএর সৌন্দর্যনাচের প্রতিটি ওঠানামা - অর্থাৎ তৃতীয় ডাইমেনশন্‌টি-তো কবি নির্দিষ্ট করে দেন নি
- এই তৃতীয় ডাইমেনশন্‌টি টু-ডাইমেনশনাল স্বরলিপিতেও দেখানোই যায় না -
এবং এখানে সংগীত-শিল্পীর যে স্বাধীনতা রয়েছে তা তো কবির বাণী ও সুরের বাঁধন নিয়েও সীমাহীন। কবি তো চেয়েছেন তাঁর গানের পরিবশেনা যেন এরকমই স্বাধীন শিল্পসৃষ্টি হয়। আর যদি তাই না চান তাহলে এসব রচয়িতাকে পেছনে ফেলে সত্যিকারের সঙ্গীতশিল্পী কি এগিয়ে যেতে চাইবেন না? কারণ কোনো সঙ্গীত রচনা ও গায়কীর নির্দেশনা যদি শিল্পীর সৃষ্টিশীলতা চরিতার্থের যোগ্য না হয় তবে সেই সঙ্গীতে সত্যিকারের সঙ্গীত-শিল্পীর আগ্রহ হবে কেন? সঙ্গীত হলো রচয়িতাদত্ত সুরের সীমার মধ্যে সৃষ্টির লীলা, যা অন্য কথায় বলা যায় অসীমের লীলা, কারন সৃষ্টির কোনো সীমা নেই। রচয়িতা সুরের যে ছক এঁকে দেন তা সসীম, কিন্তু তার রসের, তার সৌন্দর্যের কোনো সীমা নেই। এই রস, এই সৌন্দর্য অনির্বচনীয়, আর কবি বলেছেন এই অনির্বচনীয়টুকুই সঙ্গীত। এই অনির্বচনীয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তার রূপসৃষ্টিই সব শিল্পের উদ্দেশ্য, তার প্রেরণা। এই প্রশ্নে কবি নিজে কোনো ভূল করেননি, তিনি বরাবর এখানেই অবস্থান করেছেন। কিন্তু এদেশে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনেক ধারক, শিক্ষক, ভূল করেননি এ কথা বোধ হয় বলা যায় না।

এদেশের, এবং এদেশে রবীন্দ্রসঙ্গীতের, পরম দুর্ভাগ্য যে নীলুফার ইয়াসমিনের মতো সঙ্গীত-শিল্পীকে, যিনি গীতবিতান বিছানায় নিয়ে ঘুমোতে যেতেন তাঁকে, রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করতে সাহস করবার আগেই মৃত্যুবরণ করতে হলো।[৩]

সম্প্রতি আর একজন উদীয়মান শিল্পী যিনি মূলত: আধুনিক গান করেন তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি সিডি করেছেন (ফাহমিদা নবী:"আমার বেলা যে যায়") যাতে তাঁর নিজের মনের মাধুরি দিয়ে গাওয়া কয়েকটি গান প্রশংসার দাবী রাখে। তাঁর কন্ঠে এখনো কিছু টেক্‌নিকাল ত্রুটি আছে[৪] যা আশা করি তিনি কাটিয়ে উঠবেন, বিশেষ করে তাঁর হিতাকাঙ্খীরা যদি এব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শুধুমাত্র তাঁর প্রশংসা না করে যাতে তাঁর সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ হয়। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত যে সব দক্ষ সঙ্গীত-শিল্পীরই গান হতে পারে এর জন্য বিশেষ কোন 'ঘরানা'য় নাম লেখাতে হয় না একথা তিনি ইচ্ছা করলে প্রমাণ করতে পারেন।

নির্দ্বিধায় আরো বলতে পারি, ভারতের এবছরের Indian Idol প্রতিযোগিতা যা এখন শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে - এদের মধ্যে শীর্ষে-ওঠা তিন তরুণ কণ্ঠশিল্পী (অমিত, ইমন, প্রশান্ত)-র যে কারো কণ্ঠে ও

গায়কীতে কবির সুদুরের জন্য আকুল "আমি চঞ্চল হে" কল্পনায় শুনে আমি শিহরিত হচ্ছি, আর আঙ্কিতার কণ্ঠে ও নাচে "ওহে জীবনবল্লভ" গানটির কল্পনাও আমাকে তেমনি বিহ্বল করছে। আর বিচারকরা-যে প্রতিযোগীদের অন্যের গাওয়া জনপ্রিয় গান গাইতে গেলেও সুর-ছন্দ একই রেখে অনুকরণ না করে নিজের সৃষ্টিশীলতা দিয়ে গাইবার প্রতি জোর দিয়ে চলেছেন এ-তো রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথেরই কথা ।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে তবলার ব্যবহার

রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কীর প্রশ্নের সঙ্গে তবলার ব্যবহারের প্রশ্নটিও বিশেষভাবে জড়িত। এ-গানের আনুষ্ঠানিক পরিবেশনায় তবলার সঙ্গত অপরিহার্য বলেই যেন প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং এই সঙ্গত অনেক সময়েই এ গানে রসের সাথী না হয়ে যেন একটি যান্ত্রিক নিয়ম পালন করে, যাতে সামগ্রিকভাবে গানের কাব্যরস ব্যাহত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে শিল্পীর ওপর একটা অনুশাসনের কাজ করে।

সুগায়ক রবীন্দ্রনাথ নিজে তবলার তাল সহযোগে কখনোই গান করেন নি, তাঁর সময়ে অনেক রবীন্দ্রসংগীত গায়ক-গায়িকাও করেন নি, এমনকি রেকর্ড করতে যেয়েও। আমি সম্প্রতি এদেশের রোমাঞ্চকর গল্প লেখক জনাব আনোয়ার হোসেনের কাছে একবার কবির ঢাকায় সফরে সঙ্গীত পরিবেশনার কাহিনি শুনি যা তিনি মরহুম ওস্তাদ মুনীর হোসেনের কাছে শুনেছিলেন এবং যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কবি গান করবেন বলে ঢাকার ওস্তাদরা সব এসেছিলেন এবং খুব আড়ম্বড় করে তানপুরা ও তবলার সারি সাজিয়ে রেখেছিলেন। কবি এসে তবলাগুলোর দিকে তাকিয়ে বল্লেন *"ওসব থাক্, আমি কবিমানুষ, আমার গান তো কবিতা, সে তার আপন ছন্দে চলে।"*

রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখায় তাঁর গানে তাল ও তবলা-সংগত সম্বন্ধে বেশ কিছু আলোচনা রয়েছে যা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি যা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ও অনুরাগী সকলেরই জানা এবং তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা অত্যন্ত প্রয়োজন:

"তালও ভাবপ্রকাশের একটা অঙ্গ। যেমন সুর তেমনি তালও আবশ্যকীয়, উভয়ে প্রায় সমান আবশ্যকীয়।...[তবে] ভাবকে স্বাধীনতা দিতে হইলে সুর এবং তালকেও অনেকটা স্বাধীন করিয়া দেওয়া আবশ্যক, নহিলে তাহারা ভাবকে চারি দিক হইতে বাঁধিয়া রাখে। এই-সকল ভাবিয়া আমার বোধ হয় আমাদের সংগীতে যে নিয়ম আছে যে, যেমন-তেমন করিয়া ঠিক একই স্থানে সমে আসিয়া পড়িতেই হয়, সেটা উঠাইয়া দিলে ভালো হয়। তালের সমমাত্রা থাকিলেই হয়, তাহার উপরে আরোও কড়াক্কড় করা ভালো বোধ হয় না। তাহাতে স্বাভাবিকতার অতিরিক্ত হানি করা হয়। মাথায় জলপূর্ণ কলস লইয়া নৃত্য করা যেরূপ, হাজার অঙ্গভঙ্গি করিলেও একবিন্দু জল উথলিয়া পড়িবে না, ইহাও সেইরূপ একপ্রকার কষ্টসাধ্য ব্যায়াম। সহজ স্বাভাবক যে-একটি শ্রী আছে ইহাতে তাহার যেন ব্যাঘাত করে; ইহাতে কৌশল প্রকাশ করে মাত্র।...
"আমাদের সঙ্গীতে কৃত্রিম তালের প্রথা ভাবের হস্তপদে একটা অনর্থক শৃঙ্খল বাঁধিয়া দেয়। যাঁহারা এ প্রথা নিতান্ত রাখিতে চান তাঁহারা রাখুন, কিন্তু তালের প্রতি ভাবের যখন অত্যন্ত নির্ভর দেখিতেছি তখন আমার মতে আর-একটি অধিকতর স্বাভাবিক তালের পদ্ধতি থাকা শ্রেয়। আর-কিছু করিতে হইবে না, যেমন তাল আছে তেমনি থাকুক, মাত্রা-বিভাগ যেমন

আছে তেমনি থাকুক, কেবল একটা নির্দিষ্ট স্থানে সমে ফিরিয়া আসিতেই হইবে এমন বাঁধাবাঁধি না থাকিলে সুবিধা বই অসুবিধা কিছুই দেখিতেছি না।"("সংগীত ও ভাব", *সংগীত চিন্তা*: ৬-৭)

"কবিতায় যেটা ছন্দ, সংগীতে সেইটেই লয়। এই লয় জিনিসটি সৃষ্টি ব্যাপিয়া আছে, আকাশের তারা হইতে পতঙ্গের পাখা পর্যন্ত সমস্তই ইহাকে মানে বলিয়াই বিশ্বসংসার এমন করিয়া চলিতেছে অথচ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে না। অতএব কাব্যেই কী, গানেই কি, এই লয়কে যদি মানি তবে তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটিলেও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই।" ("সংগীতের মুক্তি", *সংগীতচিন্তা*:৬৪-৬৬)

একথাও জানা যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান স্বরলিপিকারদের লিপিবদ্ধ করতে দেবার সময় মূলত: গানের ছন্দই দেখিয়ে দিয়েছেন, গানের সোম-ফাঁকযুক্ত শাস্ত্রীয় তাল নির্দেশ করে দেন নি, এবং স্বরলিপিকাররাই নিজেরা হিসাব-নিকাশ করে গানটি কোন্ শাস্ত্রীয় তালে পড়বে - যথা চার-মাত্রা চার-মাত্রা ছন্দের গান কাহারবা তালে গাঁথা হবে না ত্রিতালে, কোথায় সম্ কোথায় ফাঁক পড়বে ইত্যাদি - তা নির্দ্ধারিত করেছেন, কবি নিজে এ সম্বন্ধে মাথা ঘামান নি। রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনায় সোম-ফাঁক নিয়ে শাস্ত্রীয় তালের দিকে বেশি নজর চলে গেলে গানের রসহানি হয় দেখে, এবং রবীন্দ্রনাথের তাল সম্বন্ধে ওপরে উক্ত দর্শন বুঝে, শ্রী শৈলজারঞ্জন মজুমদার তাঁর শেষের দিকের কিছু স্বরলিপিতে শাস্ত্রীয় তালে স্বরলিপি না করে শুধু মাত্রা-বিভাগ দেখিয়েছেন - যথাঃ ৫৮ নং স্বরবিতানে "বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে" গানের স্বরলিপিতে চার মাত্রা করে ভাগ যা কোন শাস্ত্রীয় তালে পড়ে না। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্যনীয়-যে রবীন্দ্রনাথ নিজে বেশ কিছু নতুন 'তাল' উদ্ভাবন করেছেন একথা সবারই জানা, কিন্তু তাঁর তাল-দর্শন থেকে একথা স্পষ্ট যে তিনি এসমস্ত তালের ছন্দকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, সোম-ফাঁকের নিয়মকে নয়, এবং এসব গানের স্বরলিপিতে যে সোম-ফাঁকের নির্দেশ রয়েছে এগুলি স্বরলিপিকারদের ওস্তাদি যা নিয়ে কবি গান ধরে ধরে বিবাদে না যেয়ে তাঁর বিভিন্ন লেখাতে তালের সার্বিক প্রশ্নটি আলোচনা করেছেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে তবলার সঙ্গত সম্বন্ধে কবির নিজের লিখিত চিন্তা ছাড়া পশ্চিম বাংলার রবীন্দ্রসঙ্গীত-সাহিত্যে বেশ কিছু আলোচনা পাওয়া যায় যা, দু:খের বিষয়, বাংলাদেশে একেবারেই আলোচিত হয় না অথচ যা রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রত্যেক শিক্ষায়তনের শিক্ষাক্রমে থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। সত্যজিত রায়ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে তবলার ব্যবহারের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেনঃ

"তবলার সংগতে ওস্তাদি মেজাজটা বড়ো চট্ করে এসে পড়ে।... কাজেই ওটার বদলে যন্ত্রকেই তালের কাজে লাগানো উচিত" (সত্যজিত রায়, *বিষয় রবীন্দ্রসঙ্গীত,* সংগীত-শিক্ষায়তন, কলকাতা:৩০)

আরো অন্যান্য আলোচনার মধ্যে ১৯৯১ সালের নভেম্বরে কলকাতায় রবীন্দ্রচর্চাভবনে এক আলোচনা চক্রে পরিবেশিত "রবীন্দ্রসঙ্গীতে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীভি বালসারার লিখেছেন (*রবীন্দ্রসংগীত: প্রয়োগ ও পরিবেশন আলোচনা চক্র, টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট,* কলকাতা: ২৫):

"রবীন্দ্রসঙ্গীত ভাষায় ও ছন্দে সম্পূর্ণ। গান আরম্ভ হলেই তার ছন্দের দোলা এবং বক্তব্যের পূর্ণ নিষ্পত্তির ইঙ্গিত স্থায়ী অংশেই বোঝা যায়। সুতরাং তবলা বাজিয়ে ছন্দের দোলাকে ব্যবচ্ছেদ করবার প্রয়োজন বোধ করি নিষ্প্রয়োজন।...আমার আর একটি বক্তব্য আছে

- ধরুন তাঁর সঙ্গীতে দিনুবাবুর গলাতেও তালভঙ্গ হয়েছে। কিন্তু মনে রাখবেন সুরের তাল একরকম আর কবিতার ছন্দ আর এক রকম। সুরকে যে কোনও তালেই গাওয়া যায় তার নির্দিষ্ট কোনও তাল নেই কিন্তু সঙ্গীত কথার ভাব অনুসারে ছন্দে বাঁধা। সঙ্গীতে তাল অপেক্ষা লয়েরই বেশী প্রয়োজন। ... রবিবাবুর সঙ্গীত লয়ভ্রষ্ট হয় না, কেননা তার সঙ্গীত কবিতা হিসাবেও খুব বড়ো। ”

এসব পন্ডিতদের আলোচনার দোহাই দিয়ে আমি নিজে একথা বলছি না যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে তবলা কখনোই ব্যবহার করা উচিত নয়। গানের, ও গায়কের নিজস্ব গায়কীর রস বুঝে কোন তবলা-শিল্পী যদি সেই রস-নৃত্যের যথার্থ সাথী হতে পারেন তাহলে হবেন না কেন? আর আজকে তো রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে কীবোর্ড ইত্যাদি অনেক রকম যন্ত্র নিয়ে অনেক রকম এক্সপেরিমেন্ট চলছে, তাতে যদি আপত্তি না থাকে তাহলে তবলার সঙ্গে গাওয়াতেই বা আপত্তি থাকবে কেন। সবচেয়ে বড়ো কথা রবীন্দ্রসঙ্গীতের কাব্যরসটি শিল্পীর নিজস্ব ইনটারপ্রিটেশন দিয়ে ফুটিয়ে তোলা, তাতে যে কোন সংগত শিল্পী নিজে বেছে নেবেন তাঁর সৌন্দর্যনৃত্যের সাথী হিসাবে, এবং শ্রোতাদেরও এই যুগল রস মজিয়ে দিতে পারবে সেই সংগত অবশ্যই পরম কাম্য। আপত্তিটা শুধু যে-কোন সংগতই সঙ্গীত-শিল্পীর ওপর চাপিয়ে দেয়ার প্রশ্নে।

৩. রবীন্দ্রসঙ্গীতে যথার্থ শিক্ষকের অভাব

এদেশে রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিক্ষকতার সবচেয়ে বড়ো দৈন্য এই যে একদিকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-চিন্তা এভাবে তো আলোচনা করাই হয় না, আর অন্যদিকে মূলত: শিক্ষার্থীদের গানের সুর-তাল-লয় শেখানো হয়, গানের লাইন ধরে ধরে শিক্ষক গেয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের তার পুনরাবৃত্তি করতে বলেন, সঙ্গীতের চেতনা শেখানো হয় না, বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীল হয়ে গানের ভাবকে নিজের নিজের ইনটারপ্রিটেশন দিয়ে তাকে যথার্থ শিল্প (আর্ট) হিসাবে প্রকাশ করতে উৎসাহ ও গাইডেন্স দেয়া হয় না। আরো দু:খজনক কথা, কোন কোন রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিক্ষক মহলে এই ভ্রান্ত ধারনাটাও রয়ে গেছে যে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার একটি বিশেষ গায়কী বা ধরণ রয়েছে, ঠিক সেইভাবে না গাইলে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া ঠিক হলো না। এরকম শিক্ষকের অধীনে শিক্ষা গ্রহন করে সৃষ্টিশীলভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে নিজের শিল্প হিসাবে সৃষ্টি করবার প্রেরণা, সাহস ও দক্ষতা শিক্ষার্থীর হবে কেমন করে? চিত্রকলার শিক্ষক যেমন শিষ্যকে কখনোই তাঁর নিজের আঁকা ছবি নকল করতে শেখাবেন না, তাকে স্বাধীনভাবে নিজের ছবি আঁকবার চেতনা এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় গাইডেন্স ও রং-তুলির ব্যবহার ইত্যাদি শেখাবেন, সঙ্গীত-কলার শিক্ষকেরও তো দায়িত্ব শিষ্যকে যান্ত্রিকভাবে তাঁর গাওয়া অনুকরণ না করে রচয়িতা-দত্ত কথা এবং সুর-তাল দিয়ে নিজের ছবি আঁকবার জন্য প্রয়োজনীয় গাইডেন্স দেয়া।

এই গাইডেন্স সহজ নয়, এবং শুধু নিজে খুব ভালো গাইয়ে হলেই ভালো সঙ্গীত শিক্ষক হওয়া যায় না একথা বলাই বাহুল্য। আমার নিজের দুটি অভিজ্ঞতা শেয়ার করলে হয়তো শিক্ষকতার দায়িত্বের একটি উপাদান বুঝতে সহজ হতে পারে:

কয়েক বছর আগে রবীন্দ্র সঙ্গীতের একজন ছাত্রী আমাকে একটি গান শোনায় -“এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে মুকুলগুলি ঝরে।” গানটি গেয়ে সে আমার মতামত চাইলো। এই গানটি সে গাইলো একটু দ্রুত লয়ে, যাতে সুর তাল ঠিক হলেও গানটির কাব্যার্থ ঠিক প্রকাশ হল না। আমি তাকে গানটি গেয়ে দেখিয়ে দিতে চাইলাম না, কারণ তাহলে সে আমাকে অনুকরণ করতে পারে। কিভাবে তাকে

সাহায্য করা যায় একটু চিন্তা করে তারপর বললাম "তুমি কি বলতে চাইলে আমি কিছু বুঝলাম না। তুমি কবিতাটা একটু মন দিয়ে পড়ো। তারপর শুধু প্রথম দুটো লাইন গেয়ে আমাকে বুঝিয়ে দাও এই লাইন দুটোতে কী বলা হচ্ছে।"

মেয়েটি একটু থতমত খেয়ে চুপ হয়ে গেল এবং কিছুক্ষণ খুব মন দিয়ে কবিতাটির দিকে
তাকিয়ে থাকলো। তারপর লয় কমিয়ে লাইন দুটি অনেক গভীরবাবে গেয়ে পরিষ্কার দেখিয়ে দিল উদাসী হাওয়ার পথে পথে মুকুলগুলি ঝরছে, সে সেই মুকুলগুরো কুড়িয়ে কারো চরণে দিয়ে বলছে এগুলো তোমার করুণ করে তুলে নাও। তার গাওয়া আরো অনেক উন্নত হতে পারতো, এবং এই সাধনার তো শেষ নাই; কিন্তু এবার মেয়েটি নি:সন্দেহে কাব্যসঙ্গীত
হিসেবে গানটি স্পর্শ করলো।

এরকমই আর একটি অভিজ্ঞতা: একটি নাম করা সঙ্গীত বিদ্যায়তন থেকে প্রথম হয়ে পাশ করা একটি মেয়ে আমাকে শোনালো রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত "আমার পরাণ যাহা চায়" গানটি। কবির ভাষাতেই মেয়েটি অত্যন্ত "মিষ্ট গায়ক", বেশ গলা খুলে গানটি গেয়ে দিল, শুনে কানে ভারী মিষ্টি লাগলো। তারপর সে আমার মতামত চাইলো। আমি তাকে শুধু বল্লাম, "তুমি কি সত্যিই ওরকম মহা আনন্দে বিরহে বিলীন হয়ে যাবে?"

সঙ্গীত ও আধুনিক কণ্ঠবিজ্ঞান

সবশেষে, এদেশে রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং অন্যান্য সঙ্গীতেরো শিক্ষকদের, যে বিরাট ঘাট্তি রয়েছে তা হলো আধুনিক কণ্ঠবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয়ের অভাব। আজকে আধুনিক প্রযুক্তির দৌলতে মানবদেহের সঙ্গীত-যন্ত্রের সমস্ত অলিগলি বেশ ভালোভাবেই জানা হয়ে গেছে, যার ফলে কণ্ঠের রেঞ্জ বাড়াবার এবং অনায়াসে ওঠানামার কৌশল অত্যন্ত সহজ হয়ে গিয়েছে - কথা বলবার মতোই সহজ - শুধুমাত্র নিয়মিত, যোগ ব্যায়ামের মতোই, ভোকাল কর্ড স্ট্রেচিং জাতীয় কিছু এক্সারসাইজ করে গেলে। আমার নিজের এ-সম্বন্ধে কিছু স্টাডি করবার সুযোগ হয়েছে, এবং আমি যত খারাপই গাই এই বৃদ্ধ বয়সেও আমার কণ্ঠ ক্রমাগত উন্নত হয়েই চলেছে। আমি এই বিষয়ে এদেশে, কলকাতায় ও শান্তিনিকেতনে কয়েকটা কর্মশালা দিয়ে আমার সামান্য জ্ঞান শেয়ার করেছি। এতে যে বিশেষ অভিজ্ঞতাটি হয়েছে তা হলো পশ্চিম বাংলায় শুধু সঙ্গীত-শিক্ষার্থীরা ও শিল্পীরাই নন, সঙ্গীত শিক্ষকরাও, এমনকি ভারতের নামকরা ওস্তাদদের কাছে শেখা অনেক খেতাব পাওয়া সঙ্গীত-গুরুরা, এবং সঙ্গীত-অপেরা পরিচালকরাও এরকম কর্মশালা কেউ দিচ্ছে জানলে এসে বসে থাকেন এখানে আর কি শেখা যায় এই তৃষ্ণায়, কিন্তু বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত কোন প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত-শিল্পী বা সঙ্গীত-শিক্ষক এরকম কোন কর্মশালায় আসতে আগ্রহ দেখান নি। দুই বাংলার সঙ্গীত মহলের এই পার্থক্য দু:খজনকভাবে একটি বিরাট সত্যকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়: আমরা অতি অল্প জেনেই জানা শেষ হয়ে গিয়েছে এখন শুধু ফসল তোলবার সময় এই অহমিকায় ভুগছি, আর ওপার বাংলায় অনেক জেনেও আরো জানবার ও নিজেকে আরো উন্নত করবার, এবং শিষ্যদের আরো উন্নত শিক্ষা দেবার, তৃষ্ণা মিটছে না। এব্যাপারে সঙ্গীত-শিক্ষকদের দায়িত্বই যে সবচেয়ে বেশি একথা বলবার অপেক্ষা রাখে না। বিশ্বায়নের অনেক খারাপ দিক আছে যেগুলি বর্জনীয়। তবু তাদের অনেক কিছুর পেছনেই আমরা ছুটছি, কিন্তু যা কিছু আমাদের সৃষ্টিশীলতার বিকাশে সহায়ক তা কি আমরা গ্রহণ করতে আগ্রহী হবো না? না হলে ক্ষতিটা শুধু সঙ্গীত-শিল্পীর নিজেরই নয়, যাঁরা ভবিষ্যতের সঙ্গীত-শিল্পী

তৈরি করবার দায়িত্ব নিচ্ছেন সেই শিক্ষকরাও তো দায়ী হবেন তাঁদের শিষ্যদের পেছনে রেখে দেবার জন্য যেখানে অন্যান্য দেশের সঙ্গীত-শিল্পীরা এগিয়ে যাচ্ছেন।#

চার: মিডিয়াতে যোগ্য সমালোচকের অভাব

সঙ্গীত একটি পারফর্মিং আর্ট বিধায় সঙ্গীত-শিল্পীদের ক্যারিয়ারে মিডিয়ার রিপোর্টিং-এর ভূমিকা স্বভাবতই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দু:খের বিষয় এ-ব্যাপারেও বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

১৯৯৭ সালে কলকাতায় রবীন্দ্রসদনে বাংলাদেশের রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পীদের যে অনুষ্ঠানের উল্লেখ করেছি সেই অনুষ্ঠানের সমালোচনায় *দি স্টেটসম্যান* পত্রিকায় প্রায় সকলের গানেরই মোটামুটি প্রশংসা করে আমাদের একজন এদেশে খুব নাম করা শিল্পীর সম্বন্ধে এই মন্তব্য উঠেছিল:

"The big disappointment was ... whose recital was totally marred by her indiscriminate pauses for breath ..." (18.7.97)

একই সমালোচনা দেশ পত্রিকাতেও উঠেছিল: *"...-এর গানের দম্ তাঁর স্ববশে ছিল না"*।

আমাদের দেশের বহুল প্রশংসিত ও অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন গায়িকা (নাম উল্লেখ করলাম না বর্তমান আলোচনায় তা অবান্তর বলে)-র গান সমন্ধে কলকাতার দুটি প্রথম সারির পত্রিকায় এরকম মন্তব্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক একথা বলাই বাহুল্য, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা তাঁর গানের এই মারাত্মক ত্রুটি যা কলকাতার সমস্ত অনুষ্ঠানটিকেই নষ্ট করে দিযেছিল বলে মন্তব্য হয়েছিল তা আমাদের দেশের কোনো রিভ্যুিয়ারের নজরে কী কখনোই পড়ে নি। পড়ে থাকলে তার (গঠনমূলকভাবে) উল্লেখ করলে কী শিল্পীকেই তাঁর দক্ষতা তথা পরিবেশনা উন্নত করতে সাহায্য করা হতো না।

এদেশের আর একজন প্রখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী, যিনি এদেশ থেকে সর্বপ্রথম বিশ্বভারতীর মিউজিক বোর্ডের অনুমোদিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্যাসেট বার করবার সম্মান পান, তিনি সুগায়ক ছাড়া অত্যন্ত বিনম্রী এবং সব সময়েই আরো উন্নতি করতে আগ্রহী। তিনি নিজেই আমাকে কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকায় তাঁর ক্যাসেটের রিভ্যু দেখান। এই রিভ্যুতে তাঁর কণ্ঠের এবং গানের সার্বিক মানের বেশ প্রশংসা ছিল, কিন্তু একথাও ছিল যে তিনি কোন্ গানটি কোন্ সুবিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পীর রেকর্ড থেকে তুলেছেন সেটা বোঝা যায়!

পশ্চিম বাংলার মিডিয়ার সঙ্গীত-রিপোর্টিং-এর এই স্ট্যান্ডার্ডের বিপরীতে আমাদের সঙ্গীতানুষ্ঠানের রিপোর্টাররা সাধারণত: গান যেরকমই হোক্ মূলত: "শ্রোতারা দারুণ মুগ্ধ হয়েছেন"; বর্ষার গানের অনুষ্ঠান হলে গানের মান যাই হোক্ না কেন "শ্রোতারা সবাই বর্ষায় স্নাত হয়ে গেলেন", মূলত: এরকম মন্তব্য করেই তারপর কী কী গান গাওয়া হলো তার একটা লিষ্ট দিয়ে সংবাদপত্রের কলাম ভর্তি করে ফ্যালেন, গানের গুনগত মানের কোন সযত্ন আলোচনার দিকে যান না। এর কারণ হয় তাঁদের রিভ্যুিয়ার হিসাবে যোগ্যতার অভাব, নয় শিল্পীদের ও তাঁদের প্রতিষ্ঠানকে খুশি রাখবার বাসনা। কিন্তু এতে তো আমাদের শিল্পীদের মান উন্নয়নের জন্য তাঁরা সাহায্য করছেন না, বরঞ্চ দ্বিধাহীন্ প্রশংসায় এই উন্নয়নের সম্ভাবনা রুদ্ধই হচ্ছে।

এই সংস্কৃতির ব্যতিক্রম দেখেছি সম্প্রতি ডেইলি স্টার-এর সাংস্কৃতিক রিভ্যুতে। গত ৭ই আগষ্ট ভারতীয় হাই কমিশন ঢাকার জাদুঘরে কলকাতা থেকে একজন গায়িকাকে এনে তাঁর গান উপহার দেন। এই পরিবেশনা বেশ নীচু মানের হয়েছিল যা সত্ত্বেও অনেক সংবাদপত্রে গায়িকার (তাঁকে "শিল্পী" একবারেই বলা যায় না) ভূয়সী প্রশংসা করে যথারীতি তাঁর গানের লিষ্ট ছাপা হয়েছিল। তবে ডেইলি স্টারের তরুণ রিভ্যুয়ার (করিম ওয়াহিদ) তার প্রাণহীন গানের সমালোচনা করে লিখেছিলেন যে "তোমার খোলা হাওয়া" ওরকম নীরস ভাবে গাইলে কী গানটির প্রতি সুবিচার করা হলো? (*দি ডেইলি স্টার*, ৯ আগষ্ট ২০০৭) কিন্তু এরকম আকাঙ্খিত রিভ্যুয়ার এখনো এদেশে বিরল!

উপসংহার

আগেই বলেছি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের পেছনে যে প্রতিশ্রুতিগুলি ছিল তাদের মধ্যে শুধুমাত্র পূরণ হয়েছে আমাদের রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার অধিকার আদায়। এই একটিমাত্র প্রতিশ্রুতি পূরণ করে নিয়ে একে সার্থক করে তোলবার দায়িত্ব এখন আমাদেরই। এর জন্য পাঠশালার পন্ডিতদের মতো বেত হাতে "রবীন্দ্রসঙ্গীত এইভাবে গাইতে হবে" বলে শিক্ষার্থীদের শৈল্পিক সৃষ্টিশীলতাকে চেপে রেখে আমরা সামনে এগুতে পারবো না। এদেশের সঙ্গীত প্রতিভার সম্ভাবনা পাঠশালা-পর্যায়ের অনেক উঁচুতে - আমাদের তরুণ শিল্পীরা পর্বতের সর্বোচ্চ শিখরে উঠতে সক্ষম সেরকম উৎসাহ ও পথনির্দেশনা পেলে। দেবব্রত বিশ্বাস বাংলাদেশেরই পলিমাটির সন্তান, এবং তাঁর "নয়ন ছেড়ে গেলে চলে', "আকাশ ভরা সূর্য তারা", "ওগো শেফালি বনের মনের কামনা" এই গানগুলি রবীন্দ্রসঙ্গীতের "গায়কী"র সমস্ত বিতর্ককে সরিয়ে দিয়ে শ্রোতাদের বিহ্বল করে অনির্বচনীয়লোকে নিয়ে গিয়েছে যেমন নিয়েছে কলিম শরাফির "আমি তখন ছিলেম মগন" , যে গানগুলির কোনটাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের কোন 'ঘরাণা'র গায়কী অনুসরণ করে নাই। এরকম একটি, মাত্র একটি, গান উপহার দিতে পারলেই তো যে কারো শিল্পীজীবন সার্থক হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে সৃষ্ট কোন রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পীর কণ্ঠ থেকে আজ পর্যন্ত এই মানের গান শোনা যায় নাই। এ কী সত্যিই আমাদের সন্তানদেরই অক্ষমতা, না শিক্ষক-অভিভাবক-শ্রোতা-মিডিয়া-সহ দেশের সার্বিক রবীন্দ্রসঙ্গীত-সংস্কৃতির দীনতা, যে দীনতা কবির গানের গায়কীকে পাঠশালার ছাত্রদের দুলে-দুলে পাঠ মুখস্থ করবার সমান পর্যায়ে রেখে দিয়েছে তাকে মুক্ত বিহঙ্গের মতো আকাশে উড়তে আহ্বান করছে না, একথা আজকে গভীরভাবে ভেবে দেখবার সময় এসেছে। প্রথম এক পর্যায়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখবার জন্য পাঠশালায় ঢোকবার পক্ষে যুক্তি থাকতে পারে (যদিও রবীন্দ্রনাথ নিজে স্কুল পালিয়েছিলেন বলেই যেখানে হাত দিয়েছেন সেখানেই এত অসাধারণ সৃষ্টিশীল হতে পেরেছেন); কিন্তু আমাদের সেই পর্যায় বহুদিন হলো পার হয়ে গিয়েছে, এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনায় আমাদের সন্তানদের সৃষ্টিশীলতা, যে-সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে মিলনের জন্য কবির নিজের সাগ্রহ প্রতীক্ষা, শুধু দুই বাংলাকেই নয়, সারা বিশ্বকে দেখাবার সময় অনেকদিন হলো এসে গিয়েছে। কিন্তু এর জন্য রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা-প্রাঙ্গনে, বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষকদের, যে চেতনাগত ও মানসিক পরিবর্তন প্রয়োজন সেই পরিবর্তনের সূচনাও এখনো দেখা যাচ্ছে না। এই পরিবর্তনের সূত্রপাত হতে পারে হয়তো সেই শ্রোতাদের কাছ থেকেই স্পষ্ট দাবী আসলে, যে শ্রোতারা রবীন্দ্রসঙ্গীতের যান্ত্রিক পরিবশনায় অতৃপ্ত যা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, শুধু কানেই 'মিষ্ট শোনায়', অন্ত:করণে প্রবেশ করে না, যে সঙ্গীত তাকে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে শিহরিত ক'রে তার নিদ্রা হরণ করে না।

আর দেশের সব তরুণ রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের আমি রবীন্দ্রনাথেরই কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আহ্বান করছি এসো, কবির বাণী-সুর-ছন্দ নিয়ে নিজেকে প্রকাশ করো, এর জন্য কবির গানে সীমাহীন সুযোগ রয়েছে।

*মীজানুর রহিম স্মারক বক্তৃতা, খুলনা, সেপ্টেম্বর ৭, ২০০৭ ।

---

[১] ওয়াহিদুল হক, ”সংগীতে অপেক্ষিত যাত্রা”, *সুন্দরম,* গ্রীষ্ম সংখ্যা, ১৪০২।

[২] সাইয়দ আতীকুলাহ বাংলাদেশের একজন শান্তিনিকেতনে শিক্ষিতা অগ্রণী রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়িকার অতুলপ্রসাদের গান পরিবেশন সম্বন্ধে একই রকম মন্তব্য করেছেন - *দৈনিক সংবাদ,* ৩ অগ্রহায়ণ ১৩৯৯।

[৩] মৃত্যুর কিছুদনি আগে তাঁর বাসায় তাঁকে সিধুভাই-স্মারক পুরষ্কার দেবার অনুষ্ঠানে নীলুফার আমাকে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরোধ করেন এবং আমি অন্যান্য কথার মধ্যে তাঁকে বলি তিনি যেন সেরে উঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত করেন যে সঙ্গীত বুকে নিয়ে তিনি রাতে ঘুমোতে যান। নীলুফার সেই অনুষ্ঠানে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি সেরে উঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবেন। বিধাতা অবশ্য তাঁকে, এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত-রসপিয়াসীদের, এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত করেন।

[৪] এ সম্বন্ধে আমার মতামত আমি শিল্পীর কাছে পাঠিয়েছি।